এ ঋতুতে বড় একটা পাওয়া যায় না। এ ঋতু পাখি-ছুট। বর্ষায় কোকিল মৌন, কেননা দর্দুর বক্তা; চকোর আকাশদেশত্যাগী, আর চাতক ঢের হয়েছে বলে ফটিকজল শব্দ আর মুখে আনে না। যেসকল চরণ ও চঞ্চুসার পাখি, যথা বক হাঁস সারস হাড়গিলে ইত্যাদি, এ ঋতুতে স্বেচ্ছামত জলে-স্থলে ও নভোমণ্ডলে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, তাদের গঠন এতই অদ্ভুত এবং তাদের প্রকৃতি এতই তামসিক যে, তারা যে বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি সেবিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। বস্তুতন্ত্রতার খাতিরে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হতে রাজি আছি, কিন্তু বিশ্বামিত্রের জগৎ পর্যন্ত নয়। তার পর কাব্যের উপযোগী ফুল ফল লতা পাতা গাছ বর্ষায় এতই দুর্লভ যে, মহাকবি কালিদাসও ব্যাঙের ছাতার বর্ণনা করতে বাধ্য হয়েছেন। সংস্কৃতভাষার ঐশ্বর্যের মধ্যে এ দৈন্য ধরা পড়ে না, তাই কালিদাসের কবিতা বেঁচে গেছে। বর্ষার-দুটি নিজস্ব ফুল হচ্ছে কদম আর কেয়া। অপূর্বতায় পুষ্পজগতে এ দুটির আর তুলনা নেই। অপরাপর সকল ফুল অর্ধবিকশিত ও অর্ধনিমীলিত। রূপের যে অর্ধপ্রকাশ ও অর্ধগোপনেই তার মোহিনীশক্তি নিহিত, এ সত্য স্বর্গের অপ্সরারা জানতেন। মুনিঋষিদের তপোভঙ্গ করবার জন্য তাঁরা উক্ত উপায়ই অবলম্বন করতেন। কারণ ব্যক্ত-দ্বারা ইন্দ্রিয় এবং অব্যক্ত-দ্বারা কল্পনাকে অভিভূত না করতে পারলে দেহ ও মনের সমষ্টিকে সম্পূর্ণ মোহিত করা যায় না। কদম কিন্তু একেবারেই খোলা, আর কেয়া একেবারেই বোজা। একের ব্যক্ত-রূপ নেই, অপরের গুপ্ত-গন্ধ নেই; অথচ উভয়েই কণ্টকিত। এ ফুল দিয়ে কবিতা সাজানো যায় না। এ দুটি ফুল বর্ষার ভূষণ নয়, অস্ত্র; গোলা এবং সঙিনের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য স্পষ্ট।

পূর্বে যা দেখানো গেল, সেসব তো অঙ্গহীনতার পরিচয়। কিন্তু এ ঋতুর প্রধান দোষ হচ্ছে, আর-পাঁচটি ঋতুর সঙ্গে এর কোনো মিল নেই; আর-পাঁচটি ঋতুর সঙ্গে এ ঋতু খাপ খায় না। এ ঋতু বিজাতীয় এবং বিদেশী, অতএব অস্পৃশ্য। এই প্রক্ষিপ্ত ঋতু আকাশ থেকে পড়ে, দেশের মাটির ভিতর থেকে আবির্ভূত হয় না। বসন্তের নবীনতা সজীবতা ও সরসতার মূল হচ্ছে ধরণী। বসন্তের ঐশ্বর্য হচ্ছে দেশের ফুলে, দেশের কিশলয়ে। বসন্তের দক্ষিণপবনের জন্মস্থান যে ভারতবর্ষের মলয়পর্বত, তার পরিচয় তার স্পর্শেই পাওয়া যায়; সে পবন আমাদের দেহে চন্দনের প্রলেপ দিয়ে দেয়। বসন্তের আলো, সূর্য ও চন্দ্রের আলো। ও দুটি দেবতা তো সম্পূর্ণ আমাদেরই আত্মীয়; কেননা, আমরা হয় সূর্যবংশীয় নয় চন্দ্রবংশীয়— এবং ভবলীলাসংবরণ করে আমরা হয় সূর্যলোকে নয় চন্দ্রলোকে ফিরে যাই। অপরপক্ষে, মেঘ যে কোন্ দেশ থেকে আসে, তার কোনো ঠিকানা নেই। বর্ষা যে-জল বর্ষণ করে, সে কালাপানির

জল। বর্ষার হাওয়া এতই দুরন্ত এতই অশিষ্ট এতই প্রচণ্ড এবং এতই স্বাধীন যে, সে-যে কোনো অসভ্য দেশ থেকে আসে, সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তার পর, বর্ষার নিজস্ব আলো হচ্ছে বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের আলো এতই হাস্যোজ্জ্বল এতই চঞ্চল এতই বক্র এবং এতই তীক্ষ্ণ যে, এই প্রশান্ত মহাদেশের এই প্রশান্ত মহাকাশে সে কখনোই জন্মলাভ করে নি। আর-এক কথা, বসন্ত হচ্ছে কলকণ্ঠ কোকিলের পঞ্চম স্বরে মুখরিত। আর বর্ষার নিনাদ? তা শুনে শুধু যে কানে হাত দিতে হয় তা নয়, চোখও বুজতে হয়।

বর্ষার প্রকৃতি যে আমাদের প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত, তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় ও-ঋতুর ব্যবহারে। এ-ঋতু শুধু বেখাপ্পা নয়, অতি বেআড়া। বসন্ত যখন আসে, সে এত অলক্ষিতভাবে আসে যে, পঞ্জিকার সাহায্য ব্যতীত কবে মাঘের শেষ হয় আর কবে ফাল্গুনের আরম্ভ হয়, তা কেউ বলতে পারেন না। বসন্ত, বঙ্কিমের রজনীর মত, ধীরে ধীরে অতিধীরে ফুলের ডালা হাতে করে দেশের হৃদয়-মন্দিরে এসে প্রবেশ করে। তার চরণস্পর্শে ধরণীর মুখে, শব-সাধকের শবের ন্যায়, প্রথমে বর্ণ দেখা দেয়, তার পরে ভ্রূ কম্পিত হয়, তার পরে চক্ষু উন্মীলিত হয়, তার পর তার নিশ্বাস পড়ে, তার পর তার সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়ে ওঠে। এসকল জীবনের লক্ষণ শুধু পর্যায়ক্রমে নয়, ধীরে ধীরে অতিধীরে প্রকটিত হয়। কিন্তু বর্ষা ভয়ংকর মূর্তি ধারণ ক'রে একেবারে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে। আকাশে তার চুল ওড়ে, চোখে তার বিদ্যুৎ খেলে, মুখে তার প্রচণ্ড হুংকার; সে যেন একেবারে প্রমত্ত, উন্মত্ত। ইংরেজেরা বলেন, কে কার সঙ্গ রাখে, তার থেকে তার চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। বসন্তের সখা মদন। আর বর্ষার সখা?— পবননন্দন নন, কিন্তু তাঁর বাবা। ইনি একলম্ফে আমাদের অশোকবনে উত্তীর্ণ হয়ে ফুল ছেঁড়েন, ডাল ভাঙেন, গাছ ওপ্‌ড়ান, আমাদের সোনার লঙ্কা একদিনেই লণ্ডভণ্ড করে দেন, এবং যে সূর্য আমাদের ঘরে বাঁধা রয়েছে তাকে বগলদাবা করেন; আর চন্দ্রের দেহ ভয়ে সংকুচিত হয়ে তার কলঙ্কের ভিতর প্রবিষ্ট হয়ে যায়। এককথায়, বর্ষার ধর্ম হচ্ছে জল-স্থল-আকাশ সব বিপর্যস্ত করে ফেলা। এ-ঋতু কেবল পৃথিবী নয়, দিবারাত্রেরও সাজানো তাস ভেস্তে দেয়। তাছাড়া বর্ষা কখনো হাসেন কখনো কাঁদেন, ইনি ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট। এমন অব্যবস্থিতচিত্ত ঋতুকে ছন্দোবন্ধের ভিতর সুব্যবস্থিত করা আমার সাধ্যাতীত।

এস্থলে এই আপত্তি উঠতে পারে যে, বর্ষার চরিত্র যদি এতই উদ্ভট হয়, তাহলে কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিরা কেন ও-ঋতুকে তাঁদের কাব্যে অতখানি স্থান দিয়েছেন। তার উত্তর হচ্ছে যে, সেকালের বর্ষা আর একালের বর্ষা এক জিনিস নয়; নাম ছাড়া এ

উভয়ের ভিতর আর-কোনো মিল নেই। মেঘদূতের মেঘ শান্ত-দান্ত; সে বন্ধুর কথা শোনে, এবং যে পথে যেতে বলে, সেই পথে যায়। সে যে কতদূর রসজ্ঞ, তা তার উজ্জয়িনী-প্রয়াণ থেকেই জানা যায়। সে রমণীর হৃদয়জ্ঞ, স্ত্রীজাতির নিকট কোন্ ক্ষেত্রে হুংকার করতে হয় এবং কোন্ ক্ষেত্রে অল্পভাষে জল্পনা করতে হয়, তা তার বিলক্ষণ জানা আছে। সে করুণ, সে কনকনিকষস্নিগ্ধ বিজুলির বাতি জ্বেলে সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে অভিসারিকাদের পথ দেখায়, কিন্তু তাদের গায়ে জল বর্ষণ করে না। সে সংগীতজ্ঞ, তার সখা অনিল যখন কীচক-রন্ধ্রে মুখ দিয়ে বংশীবাদন করেন, তখন সে মৃদঙ্গের সংগত করে। এককথায় ধীরোদাত্ত নায়কের সকল গুণই তাতে বর্তমান। সে মেঘ তো মেঘ নয়, পুষ্পকরথে আরূঢ় স্বয়ং বরুণদেব। সে রথ অলকার প্রাসাদের মত ইন্দ্রচাপে সচিত্র, ললিতবনিতাসনাথ মুরজধ্বনিতে মুখরিত। সে মেঘ কখনো শিলাবৃষ্টি করে না, মধ্যে মধ্যে পুষ্পবৃষ্টি করে। এহেন মেঘ যদি কবিতার বিষয় না হয়, তাহলে সে বিষয় আর কি হতে পারে?

কিন্তু যেহেতু আমাদের পরিচিত বর্ষা নিতান্ত উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছৃঙ্খল, সেই কারণেই তার বিষয় কবিত্ব করা সম্ভব হলেও অনুচিত। পৃথিবীতে মানুষের সব কাজের ভিতর একটা উদ্দেশ্য আছে আমার বিশ্বাস, প্রকৃতির রূপবর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে তার সৌন্দর্যের সাহায্যে মানব-মনকে শিক্ষাদান করা। যদি তাই হয়, তাহলে কবিরা কি বর্ষার চরিত্রকে মানুষের মনের কাছে আদর্শস্বরূপ ধরে দিতে চান? আমাদের মত শান্ত সমাহিত সুসভ্য জাতির পক্ষে, বর্ষা নয়, হেমন্ত হচ্ছে আদর্শ ঋতু। এ মত আমার নয়, শাস্ত্রের; নিম্নে উদ্ধৃত বাক্যগুলির দ্বারাই তা প্রমাণিত হবে:

> 'ঋতুগণের মধ্যে হেমন্তই স্বাহাকার, কেননা হেমন্ত এই প্রজাসমূহকে নিজের বশীভূত করিয়া রাখে, এবং সেইজন্য হেমন্তে ওষধিসমূহ ম্লান হয়, বনস্পতি-সমূহের পত্রনিচয় নিপতিত হয়, পক্ষীসমূহ যেন অধিকতরভাবে স্থির হইয়া থাকে ও অধিকতর নীচে উড়িয়া বেড়ায়, এবং নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের লোমসমূহ যেন (শীতপ্রভাবে) নিপতিত হইয়া যায়, কেননা হেমন্ত এইসমস্ত প্রজাকে নিজের বশীভূত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানেন, তিনি যে (ভূমি) ভাগে থাকেন তাহাকেই শ্রী ও শ্রেষ্ঠ অন্নের জন্য নিজের করিয়া তোলেন।'—শতপথ ব্রাহ্মণ

আমরা যে শ্রীভ্রষ্ট এবং শ্রেষ্ঠ অন্নহীন তার কারণ আমরা হেমন্তকে এইরূপে জানি নে; এবং জানি নে যে, তার কারণ কবিরা হেমন্তের স্বরূপের বর্ণনা করেন না, বর্ণনা করেন শুধু বর্ষার; যে বর্ষা ওষধিসমূহকে ম্লান না করে সবুজ ক'রে তোলে।

আষাঢ় ১৩২১

পত্র ১

সম্পাদকমহাশয় সমীপেষু

আপনি যে নূতন কাগজ বার করেছেন, তার যদি কোনো উদ্দেশ্য থাকে তো সে হচ্ছে নূতন কথা নূতন ধরণে বলা। এ উদ্দেশ্য সফল করতে হলে নূতন লেখক চাই, নচেৎ সবুজপত্র কালক্রমে শ্বেতপত্রে পরিণত হবে।

যদিচ আপনি মুখপত্রে 'আমি'র পরিবর্তে 'আমরা' শব্দ ব্যবহার করেছেন, তথাপি ঐ বহুবচনের পিছনে যে বহু লেখক আছেন, তার কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না। বাংলায় দ্বিবচন নেই, সম্ভবত সেই কারণেই আপনি প্রথমপুরুষের বহুবচন ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ, অদ্যাবধি কেবলমাত্র দুটি লেখকেরই পরিচয় পাওয়া গেছে : এক সম্পাদক, আর এক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে গুণতির মধ্যে ধরা গেল না ; কেননা, আপনার লেখার যা নমুনা দেখিয়েছেন তার থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, আপনার প্রধান ভরসাস্থল হচ্ছে গদ্য। কারণ, সোজা কথা বাঁকা করে এবং বাঁকা কথা সোজা করে বলা পদ্যের রীতি নয়।

আর ছিলুম আমি, কিন্তু আর বেশিদিন যে থাকব কিংবা থাকতে পারব, এমন আমার ভরসা হয় না। হয় আপনি আমাকে ছাড়বেন, নয় আমি আপনাকে ছাড়ব। আমার লেখায়, আর যাই হোক সবুজপত্রের যে গৌরব বৃদ্ধি হয় নি, একথা সর্বসমালোচকসম্মত। এ অবস্থায় 'বীরবল' অতঃপর 'আবুল-ফজল' হওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর দেখতে পাচ্ছেন না। ভবিষ্যতে আইন-ই-আঙ্গরেজি-নামক যে নববিশ্বকোষ রচনা করব 'সবুজপত্রে' তার স্থান হবে না। যদি 'ফৈজি' হতে পারতুম, তাহলেও নাহয় আপনার কাগজের জন্য একখানি দেশকালোপযোগী অর্থাৎ স্বয়ংবরা-তিরস্কৃত একখানি 'নলদমন' রচনা করতে পারতুম ; কিন্তু সে হবার জো নেই। আমাকে আবুল-ফজল হতেই হবে। আশা করি, বাংলার নবীন আবুল-ফজলদের মধ্যে কেউ-না-কেউ আমার সঙ্গে পেশা বদলে নেবেন ; কেননা, সাহিত্যরাজ্যে বীরবলেরও আবশ্যকতা আছে। ইংরেজেরা বলেন, এক কোকিলে বসন্ত হয় না— অর্থাৎ আর পাঁচ-রঙের আর-পাঁচটি পাখিও চাই। বাংলাসাহিত্যের উদ্যানে যদি বসন্তঋতু এসে থাকে, তাহলে সেখানে কোকিলও থাকবে, কাঠ-ঠোকরাও থাকবে, লক্ষ্মী-পেঁচাও থাকবে, হুতুম-পেঁচাও থাকবে। মনোরাজ্যে যখন নানা পক্ষ আছে, তখন নানা পক্ষী থাকাই স্বাভাবিক। যেমন এক 'বউ-কথা-কও' নিয়ে কবিতা হয় না, তেমনি এক 'চোখ-গেল' নিয়ে দর্শনও হয় না।

উপরোক্তভাবে বাদসাদ দিয়ে শেষে দাঁড়াল এই যে, আপনার কাগজের যা প্রধান প্রয়োজন, সেইটিই হচ্ছে তার প্রধান অভাব— অর্থাৎ নূতন লেখক। মনে রাখবেন যে, এদেশে আজকাল খাঁটি সাহিত্য চলবে না ; চলবে যা, তা হচ্ছে জাতীয় সাহিত্য ! যদিচ একথার সার্থকতা কি, সেসম্বন্ধে কারও স্পষ্ট ধারণা নেই। কোনো লেখা যদি সাহিত্য না হয়, তবুও তার আর মার নেই— যদি তা তথাকথিত জাতীয় হয়। এর কারণ, প্রথমত, আমরা বিশেষ্যের চাইতে বিশেষণের অধিক ভক্ত ; দ্বিতীয়ত, আমরা সাহিত্য-বিচার করতে পারি-আর-না-পারি, জাত-বিচার করতে জানি। বলা বাহুল্য যে, দু হাতে কখনো জাতীয় সাহিত্য গড়ে তোলা যায় না ; দু হাতে অবশ্য তালি বাজে। আপনারা যদি স্বজাতিকে অহর্নিশি করতালি দিতে প্রস্তুত হতেন, তাহলে আপনাদের হাতে জাতীয় সাহিত্য রচিত হত ; কিন্তু সেবিষয়ে আপনাদের যখন তাদৃশ উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না, তখন নূতন লেখক চাই।

বাংলা লেখবার লোকের অভাব না থাকলেও 'সবুজপত্রে' লেখবার লোকের অভাব যে কেন ঘটছে, তার কারণ নির্ণয় করতে হলে বঙ্গসাহিত্যের বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা করা আবশ্যক।

বাংলাসাহিত্যে যে আজ বসন্তকাল উপস্থিত, 'সবুজপত্রে'র আবির্ভাব তার একমাত্র প্রমাণ নয়। ইতিপূর্বেই স্বদেশী জ্ঞানবৃক্ষের নানা ডালপালা বেরিয়েছে, এবং অন্তত তার একটি শাখায়— অর্থাৎ ইতিহাসের অক্ষয় শাখায়— এমন ফুল ফুটেছে ও ফল ধরেছে, যা সমালোচকদের নখদন্তের অধিকারবহির্ভূত ; কেননা, সে ফুল তামার এবং সে ফল পাথরের।

কিন্তু আপনি পাঠকদের এই ফলাহারে নিমন্ত্রণ করেন নি। আপনি সবুজপত্রে যে ফল পরিবেষণ করতে চান, সে জ্ঞানবৃক্ষের ফল নয়, কিন্তু তার চাইতে ঢের বেশি মুখরোচক সংসারবিষবৃক্ষের সেই ফল, যা আমাদের পূর্বপুরুষেরা অমৃতোপম মনে করতেন। সেই-জাতীয় লেখকেরা হচ্ছেন আপনার মনোমত, যাঁরা কিছুই আবিষ্কার করেন না কিন্তু সবই উদ্ভাবনা করেন, যাঁরা বস্তুজগৎকে বিজ্ঞানের হাতে সমর্পণ ক'রে মনোজগতের উপাদান নিয়ে সাহিত্য গড়েন।

আমাদের সাহিত্যসমাজে কবি-দার্শনিকের ভিড়ের ভিতর বৈজ্ঞানিকদেরই খুঁজে পাওয়া ভার, অতএব আপনার স্বজাতীয় সাহিত্যিকের অভাব এদেশে মোটেই নেই। তাহলেও তাঁরা যে উপযাচী হয়ে এসে আপনাদের দলে ভিড়বেন, তার সম্ভাবনা কম ; কেননা, যাতে করে দল বাঁধে, সেরকম কোনো মতের সন্ধান আপনাদের লেখায় পাওয়া যায় না।

সকল দেশেই মনেরও একটা চলতি পথ আছে। অভ্যাসবশত এবং সংস্কারবশত দলে দলে লোক সেই পথ ধরেই চলতে ভালোবাসে; কারণ মুখ্যত সে পথ হচ্ছে জনসাধারণের জীবনযাত্রার পথ। সে পথ মহাজনদের হাতে রচিত হয় নি, কিন্তু লোকসমাজের পায়ে গঠিত হয়েছে। আপনারা বঙ্গসরস্বতীকে সেই পরিচিত পথ ছেড়ে একটি নূতন এবং কাঁচা রাস্তায় চালাতে চান। আপনারা বলেন 'সম্মুখে চল', কিন্তু বুদ্ধিমানেরা বলেন 'নগণস্যাগ্রতোগচ্ছেৎ'। আপনাদের মত এই যে, সামাজিক জীবনের পদানুসরণ করা কবি কিংবা দার্শনিকের মনের কাজ নয়। জীবনকে পথ-দেখানোই হচ্ছে সে মনের ধর্ম, অতএব কর্তব্য। সুতরাং আপনাদের দ্বারা উদ্ভাবিত, অপরিচিত এবং অপরীক্ষিত চিন্তামার্গে অগ্রসর হতে অনেকেই অস্বীকৃত হবেন। বিশেষত, যখন সে পথের একটা নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থান নেই, যদি-বা থাকে তো সে অলকা বর্তমানভারতের পরপারে অবস্থিত। শুনতে পাই, ইউরোপের সকল স্থলপথই রোমে যায়। তেমনি এদেশের সকল হাঁটাপথই কাশী যায়। কিন্তু আপনারা যখন বাঙালির মনকে কাশীযাত্রা না করিয়ে সমুদ্রযাত্রা করাতে চান, তখন যে নূতন লেখকরা সবুজপত্র নিয়ে আপনাদের সঙ্গে একপংক্তিতে বসে যাবেন, এরূপ আশা করা বৃথা। সুতরাং আপনাদের সেই শ্রেণীর লেখক সংগ্রহ করতে হবে, যাদের কাছে আপনাদের সাহিত্য অচল নয়। এ দলের বহু লোক আপনার হাতের গোড়াতেই আছে।

গত বৈশাখমাসের 'ভারতী'-পত্রিকাতে আপনি বিলেতফেরত বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচীন ব্রাহ্মণসমাজে এ সম্প্রদায়ের স্থান নেই, সুতরাং নূতন ব্রাহ্মণসমাজ অর্থাৎ সাহিত্যসমাজে এঁদের তুলে নেওয়া হচ্ছে আপনার পক্ষে কর্তব্য। অতীতের উদ্ধারের পাল্টা জবাব দিতে হলে পতিতের উদ্ধার করা আবশ্যক।

বিলেতফেরতদের লেখায়, আর-কিছু থাক্ আর না-থাক্, নূতনত্ব থাকবেই। মাইকেল দত্ত, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এই তিনটি বিলেত ফেরত কবির ভাষায় ও ভাবে এতটা অপূর্বতা ছিল যে, আদিতে তার জন্য এঁদের দুজনকে পুরাতনের কাছে অনেক ঠাট্টাবিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে যে কেউ ঠাট্টা করেন নি, তার কারণ, তিনি সকলকে ঠাট্টা করেছেন। এই থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বিলেতফেরতের হাতে পড়লে বঙ্গসাহিত্যের চেহারা ফিরে যায়।

আসল কথা, এ যুগের বঙ্গসাহিত্য হচ্ছে বিলেতি ঢঙের সাহিত্য। যে হিসেবে দাশরথি রায়ের পাঁচালি ও গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা খাঁটি বাংলাসাহিত্য, সে হিসেবে নবসাহিত্য খাঁটি বঙ্গসাহিত্য নয়। এর জন্যে কেউ-কেউ দুঃখও করেন। চোখের জল

ফেলবার কোনো সুযোগ বাঙালি ছাড়ে না। ব্যাস-বাল্মীকির জন্যও আমরা যেমন কাঁদি, পাঁচালিওয়ালাদের জন্যও আমরা তেমনি কাঁদি। কিন্তু সমালোচকেরা চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়ে দিলেও বঙ্গসরস্বতী আর গোবিন্দ-অধিকারীর অধিকারভুক্ত হবেন না, এবং দাশরথিকেও সারথি করবেন না।

আমাদের নবসরস্বতী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিতা এবং কলেজে-শিক্ষিত লোকেরাই অদ্যাবধি তাঁর সেবা করে আসছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন; কেউ ফোঁটা কেটে, কেউ হ্যাট পরে। এই প্রভেদের কারণ নির্দেশ করছি। পুরাকালে যখন ক্ষত্রিয়েরা একসঙ্গে সুরা এবং সোম পান করতেন, তখন ব্রাহ্মণেরা এই শান্তি-বচন পাঠ করতেন:

> 'অহে সুরা ও সোম, তোমাদের জন্য দেবগণ পৃথক পৃথক রূপে স্থান কল্পনা করিয়াছেন। তুমি তেজস্বিনী সুরা, আর ইনি রাজা সোম, তোমরা আপন আপন স্থানে প্রবেশ কর।'

আমরাও কলেজে যুগপৎ ইংরেজি-সুরা এবং সংস্কৃত-সোম পান করেছি। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দুটি পাকস্থলী না থাকায় সেই সুরা আর সোম আমাদের উদরস্থ হয়ে পরস্পর লড়াই করছে। আমাদের সাহিত্য সেই কলহে মুখরিত হয়ে উঠেছে। আমাদের যে নেশা ধরেছে, সে মিশ্র-নেশা। তবে কোথাও-বা তাতে সুরার তেজ বেশি, কোথাও-বা সোমের। মনোজগতে যে আমরা সকলেই বিলেতফেরত, এইকথাটা মনে রাখলে সাহিত্যমন্দিরে আপনার সম্প্রদায়কে প্রবেশ করতে সাহিত্যের পাণ্ডারা আর বাধা দেবেন না, বরং উৎসাহই দেবেন; কেননা, আমরা সকলেই ইংরেজিসাহিত্যে শিক্ষিত, আপনারা উপরন্তু ইংরেজিসভ্যতায় দীক্ষিত।

সামাজিক হিসেবে বিলেতফেরতদের এই গুরুগৃহবাসের ফল যাই হোক, সাহিত্য হিসেবে এর ফল ভালো হবারই সম্ভাবনা। কারণ ইংরেজি-জীবনের সঙ্গে ইংরেজিসাহিত্যের সম্বন্ধ অতিঘনিষ্ঠ। ইংরেজি-জীবনের সঙ্গে যাঁর সাক্ষাৎ-পরিচয় আছে, তিনি জানেন যে, ইউরোপে সাহিত্য হচ্ছে জীবনের প্রকাশ ও প্রতিবাদ; আর সে পরিচয় যাঁর নেই, তিনি ভাবেন যে ও শুধু বাদানুবাদ। সাহিত্যের ভাষ্য ও টীকা জীবনসূত্র হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে তা শুধু কথার-কথা হয়ে ওঠে। সেই কারণে নবশিক্ষিতসম্প্রদায়ের জীবনে ইংরেজি-জীবনের প্রভাব যে পরিমাণে কম, তাঁদের রচিত সাহিত্যে ইংরেজি-কথার প্রভাব তত বেশি। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমাদের স্বদেশী বক্তৃতায় ও লেখায় নিত্য পাওয়া যায়। সংস্কৃতভাষার ছদ্মবেশ পরিয়েও বিলেতি মনোভাবকে আমরা গোপন করে রাখতে পারি নে। বিদেশী ভাবকে আমি